Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
Volume-3 Issue-1 July 2024
ISSN 2583-6706 (Online)

সীমান্ত রাঢ়ী বাংলা উপভাষার গর্ভগৃহ: ছোটনাগপুরের ভাষাপরিবেশ

তপনকুমার মণ্ডল

Link : 6. https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2024/07/6_Tapan-kumar-mandal.pdf

সারসংক্ষেপ: সীমান্ত রাঢ়ী বাংলা উপভাষার ক্ষেত্রে পশ্চিম রাঢ় অঞ্চল, ঝাড়খণ্ডের কিয়দংশের অবদান অনস্বীকার্য। বিশেষ করে ছোটনাগপুর মালভূমির (উত্তর এবং দক্ষিণ)। প্রাকৃত যুগ থেকেই এতদঞ্চলে বেশ কয়েকটি লোকভাষা সীমান্ত রাঢ়ী বাংলা উপভাষাকে পরিপুষ্ট করেছিল। বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছিল বিহারে, বিহারের মগধ অঞ্চলে। মধ্যভারতীয় আর্যভাষার দ্বিতীয় ধাপের মাগধী অপভ্রংশ থেকে। পরবর্তীকালের তৃতীয় ধাপে এই অপভ্রংশ থেকে অপভ্রষ্ট হয়ে যেসব প্রাকৃতগুলির আবির্ভাব হয়েছিল তার অনেকগুলির প্রাচীন-প্রাকৃত রূপ ছোটনাগপুরের লোকভাষার মধ্যে এখনো জীবিত রয়েছে। বাংলাভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদের ভাষা, বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য-ভাষার সঙ্গেও এইসব প্রান্তিক ভাষাগুচ্ছের ভাষার মিল রয়েছে। মগধ, বৌদ্ধগয়া এবং চর্যাপদের আবিষ্কার অঞ্চল নেপালের সঙ্গে তৎকালীন বিহার প্রদেশের ভৌগোলিক অঞ্চলের নিকটস্থ যোগসূত্রটিকে মাথায় রেখেই এই গবেষণার নান্দীমুখ রচনা করতে সহায়তা করেছে। এই প্রসঙ্গে মৈথিলি, ভোজপুরী আর মগহী — বিহারী ভাষাগুচ্ছের প্রভাবকেও অস্বীকার করা সম্ভব নয়। সব মিলে উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত রাঢ়ী বাংলা ও সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশের প্রেক্ষাপটটি যে ছোটনাগপুর অঞ্চলের বিস্তীর্ণ পরিধি এবং তা-ই পশ্চিম-রাঢ়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ভাষার আদি এবং গর্ভগৃহ — তা নির্মাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে; ঝাড়খণ্ডী উপভাষাগুচ্ছের পরিক্রমার মাধ্যমেই। এই আলোচনা এভাবে এযাবৎ কেউ করার প্রয়োজন মনে করেন নি।

সূচক শব্দ: পশ্চিম সীমান্ত রাঢ়, ছোটনাগপুর অঞ্চল, প্রাকৃত লোকভাষাগুচ্ছ, সীমান্ত রাঢ়ী বাংলা উপভাষা, দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত রাঢ়, গর্ভগৃহ

সাধারণত সীমান্তরাঢ় অঞ্চল বলতে ঝাড়খণ্ড আর পশ্চিমবঙ্গের একটি ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক অঞ্চলকেই বোঝায়। এটি পশ্চিমে ছোটনাগপুর মালভূমি ও পূর্বে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ পর্যন্ত প্রসারিত। এর কয়েকটি অংশ আধুনিক ঝাড়খণ্ড রাজ্যের অন্তর্গত। উত্তর রাঢ় আর দক্ষিণ রাঢ়ের সীমারেখা আন্দাজ করতে গিয়ে সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা' নামক মূল্যবান গ্রন্থটিতে জানিয়েছেন, তৎকালীন "গৌড় ও বঙ্গের সঠিক সীমা-নির্ধারণ প্রায় অসম্ভব। মোটামুটিভাবে সে গৌড় ছিল রাঢ় ও বরেন্দ্রের এক সমষ্টিগত দেশ। রাঢ় ছিল অজয় নদ দিয়ে দু'ভাগে বিভক্ত। উত্তর রাঢ়কে বলা হতো ব্রহ্ম, দক্ষিণকে সুহ্ম (উত্তর রাঢ় ও তক্কন রাঢ়)। রাঢ় ছিল মোটামুটি আধুনিক বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগ, হয়তো তার সঙ্গে জুড়ে ছিল মানভূম ও হাজারিবাগের খানিকটা।" লেখকের অনুমান যথার্থ হয়েছিল। রামগড়, রাঁচি, হাজারিবাগ, ধানবাদ, পালামৌ তৎকালীন রাঢ় সংলগ্ন অখণ্ড ছোটনাগপুর মালভূমির অন্তর্গত অঞ্চল ছিল। কিন্তু সবসময়ই পশ্চিমবঙ্গের উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম-পুরুলিয়া-মেদিনীপুর জেলার কিয়দংশকেই সীমান্তরাঢ় অঞ্চলের অন্তর্গত মালভূমি ধরে আলোচনা করা হয়/হয়েছে। অথচ ভৌগোলিক দিক থেকে ও পরিবেশগত রুক্ষতায় এই উভয় অঞ্চলের মধ্যে তেমন তরিতফাৎ নেই। যার ফলে তারই প্রভাব পড়বে একই প্রকার ভাষাপরিবেশ রচনায়, তা খুবই স্বাভাবিক। সাধারণত পশ্চিমবঙ্গের মালভূমির পূর্বদিকের ভাগীরথী-হুগলি নদীর পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত অজয়-দামোদর নদের দুইপারের উপকূলবর্তী সমগ্র অঞ্চলগুলিকে সীমান্ত রাঢ় অঞ্চল নামেই চিহ্নিত করা হয়। এভাবেই এতদঅঞ্চল সীমান্তরাঢ়ী সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত ধরে বঙ্গভাষা আর বঙ্গসংস্কৃতিকে আলোচনা করা হয়েছে/হচ্ছে। কিন্তু এর পর আরও দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত, মানভূমের অন্তর্গত অঞ্চলগুলিতে,

ধলভূমগড়-বহড়াগোড়া-গোপীবল্লভপুর-ঝাড়গ্রাম আরও, এমনকি দক্ষিণদিকে উড়িষ্যার ময়ুরভঞ্জ-কেঁওঝর পর্যন্ত এ ভাষা-সংস্কৃতির সঙ্গেও বেশকিছু মিল পাওয়া যায় যদিও উত্তর-পশ্চিমের সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিমের ভাষাগত প্রভাব তুলনামূলক ভাবে কমে এসেছে। জীবনশৈলি আর আচরণের ফারাকও নজর কাড়ার মতোই। এতদঞ্চলের একটি প্রবাদ আছে যে, "শিখ-শিখড় নাগপুর/আধা-আধি গড়গপুর" — এই পর্যন্ত আসলে তার সাংস্কৃতিক একরূপতার বেশিরভাগ মিল প্রভাবিত ক্ষেত্রফল। আসলে প্রকৃতিগতভাবে খড়গপুরের আধাআধি পর্যন্ত চারপাশের ভূগোল আর পরিবেশগত রুক্ষতা প্রায় অনেকটাই একই রকম। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এতদঞ্চলের ভাষাকে জর্জ গ্রিয়ার্সন কথিত "South Western Bengali" নামেই স্বীকৃতি দিতেন কিন্তু একসময় এই দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের ভাষাকে "সূহ্মক বাংলা" বলে তিনি রায় দিয়েছিলেন, প্রাচীন সুহ্ম দেশের নামানুসারে। ড. সুধীরকুমার করণের মতে যার ইংরেজি নাম ছিল: 'Western language'। কিন্তু পশ্চিম সীমান্তরাঢ়ী বাংলা ভাষা-সংস্কৃতির শেকড়ের সন্ধান তথা উৎস খুঁজতে গেলে আমাদের আরও ভিতরে পশ্চিম দিকেও গড়িয়ে যেতে হবে। পশ্চিম সিংভূম জেলা পর্যন্ত যার অধুনা বিস্তার। উত্তর থেকে দক্ষিণে রাঁচির রাতু থেকে নির্গত সীমান্তবর্তী ঝাড়খণ্ডের উপর দিয়ে উড়িষ্যার কেঁওঝড়ের দিকে বয়ে চলা সুবর্ণরেখা নদীর দুইকুলের সংস্কৃতির পরিচয় হলো সীমান্তরাঢ়ী বঙ্গসংস্কৃতির উৎসধারার (ছোটনাগপুর অঞ্চল) পরিচয়। মূলত অস্ট্রিক এবং দ্রাবিড় গোষ্ঠী প্রভাবিত ঝাড়খণ্ডী বাংলাভাষা এবং সংস্কৃতি হলো তার অন্তর্গত প্রাণ। সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো, বীড়হর, খেড়িয়া-শবর, লোহরা/লোহার/ঢিকার অর্থাৎ অসুর জনজাতির এবং বাউরি, বাগদি, কুর্মি, মাহালি, রাখাল-বাগাল, ধোপা, নাপিত, ভূমিজ প্রমুখ জনজাতীয় জীবন আর উপসমাজের উৎসব-অনুষ্ঠান, ভাষাগত আদান-প্রদান ও পারস্পরিক ভাববিনিময়ের সামঞ্জস্যে পশ্চিম সীমান্তরাঢ়ী বাংলা সংস্কৃতির গর্ভগৃহকে খুঁজে নিতে হবে। না হলে ঝাড়খণ্ড-পুরুলিয়ার সাঁওতালদের সহরায় উৎসবের সঙ্গে বা কুর্মি-মাহাতদের বাঁধনা পরবের গরুখুটানো অনুষ্ঠানের (সাঁওতালদেরও); বীরভূম, বর্ধমান আর বাঁকুড়ার কার্তিক পূর্ণিমার অমাবস্যা তিথির সন্ধ্যার গরুর বিয়ের অনুষ্ঠানকে মেলানো সম্ভব হবে না অথবা পূর্ব-বীরভূমের (ময়ূরেশ্বর থানা, কিছুদিন আগেও যার চল ছিল) বিজয়া দশমীর দুপুরের গরুছুটানো নামক বর্বরোচিত অনুষ্ঠানটিকেও মেলানো সম্ভব হবে না। আরও অনেক কিছুর হদিস এভাবেই আমরা জানিও না। এই লোকসংস্কৃতির শেকড় বিচ্ছিন্নতা দেখা দেওয়ার কারণ হলো, পশ্চিম সীমান্ত রাঢ়ের ঊর্ধসীমা; তৎকালীন ছোটনাগপুরের মিশ্র-সংস্কৃতির সঙ্গে অজ্ঞতাজনিত পরিচয়ের অভাব। এই ভুল বঙ্গদেশের বিদ্বজন পণ্ডিতদের মধ্যেও দেখা দিয়েছিল। "কাঁসাই (অথবা ডুলুং) নদীর বালু আন্যে জাওয়া পাতিব গ / হামদের জাওয়া হবেক ধান গাছের পারা।" এ সব বৃত্তান্ত অধ্যয়ন করে বঙ্গের বিখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ ও গবেষক ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় সিদ্ধান্ত করেছেন, "জাওয়া একান্ত ভাবেই পুরুলিয়া জেলার পশ্চিমাংশেই সীমাবদ্ধ... ইহার প্রভাব ক্ষীণতর হইয়া বাঁকুড়া জেলার পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত আসিয়া ইহা একেবারেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।" "বাংলার লোক সংস্কৃতি" বইতে তিনিই আবার কুমারী মেয়েদের অনুষ্ঠান ভাঁজো-কে এবং জাওয়াকে পৃথক পৃথক রূপে আলোকপাত করেছেন এবং এই অনুষ্ঠানকে বৃষ্টি কামনার উৎসব বলেই রায় দিতে চেয়েছেন। অথচ ঝাড়খণ্ডের পূর্ব সিংভূমের সর্বত্র অত্যন্ত ধুমধামের সঙ্গে করম পরবের সময় জাওয়া পরব পালন করা হয়। এটি মূলত মেয়েলি (কুমারী) ব্রত। বীরভূমে এর নাম ভাজুই। মধ্যপ্রদেশের নাম ভোগলী। আশুতোষবাবুকে কেউ বলেন নি: "সবনরিখার বালু আন্যে জাওয়া পাতিল গ... " — এটি মূলত প্রজনন শক্তির বা ফসল ফলনের উৎসব। লোকসংস্কৃতির শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হলে এরকমই বিপদ হয়। এই ধরনের ভ্রান্তি ঝাড়খণ্ডী বাংলা ভাষার আলোচনার ক্ষেত্রেও ঘটেছে। ড. সুকুমার সেন বলেছিলেন ঝাড়খণ্ডী বাংলা উপভাষায় নাকি বঙ্গালী উপভাষার পূর্ববঙ্গের অপিনিহিতি'র উচ্চারণরীতি (রাতি>রাইত, চুল>চুইল ইত্যাদি) নেই। বিষয়টি প্রতিবাদ করেন ঝাড়খণ্ডের প্রবাদ প্রতিম ভাষাতাত্ত্বিক ড. ধীরেন্দ্রনাথ সাহা। এ বিষয়ে তিনি ঝাড়খণ্ডের বিখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ ড. বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত মহাশয়ের 'শিলালিপি' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখে ভাষাতাত্ত্বিক ড. সুকুমার সেনকে উপহার দিয়ে প্রশংসিত হন। তাঁর দুটি বিখ্যাত ভাষাতত্ত্বের বই আছে। তার মধ্যে "ঝাড়খণ্ডী বাংলা উপভাষা"র উপর লেখা বইটি অধ্যাপক ড. সুকুমার সেনকে উৎসর্গ করা। শুধু কি তাই-ই! বাংলা উপভাষার আলোচনার শুরুর দিকে ড. সুকুমার সেন ঝাড়খণ্ডী বাংলা উপভাষাকে আলাদা করে স্বীকৃতি না দিয়ে রাঢ়ী উপভাষার বি-ভাষা নামেই চিহ্নিত করেছিলেন। ড. সুধীরকুমার করণ মহাশয় অবশ্য রাঢ়ের উপাঞ্চলিক উপভাষা বা সীমান্ত রাঢ়ী উপভাষার মধ্যেই ঝাড়খণ্ডী উপভাষার আলোচনা করার পক্ষপাতী। কিন্তু ড. ধীরেন্দ্রনাথ সাহার বক্তব্য মেনে নিয়ে ভাষাচার্য ড. সুকুমার সেন মহাশয় "ঝাড়খণ্ডী উপভাষা" নাম দিয়ে বাংলা উপভাষার ইতিহাসে অপর একটি নাম যুক্ত করেছেন। কিন্তু ঝাড়খণ্ডের কোনো কোনো অঞ্চল এই উপভাষার অন্তর্গত তা কিন্তু তিনি উল্লেখ করতে পারেন নি। এসব বৃত্তান্ত তুলে ধরার উদ্দেশ্য অন্য কিছু নয়, সীমান্ত রাঢ়ী সংস্কৃতি ও সীমান্ত রাঢ়ীর ক্ষেত্রসমীক্ষা করে সীমান্ত বাংলা রাঢ়ী উপভাষার দিক নির্নয় করে (পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে যার প্রবহমান গতি!) মূল বিষয়টির আলোকপাত করা। বিষয়টি সঠিক

মনে হলে পাঠক গ্রহণ করতে পারেন।

বাংলাভাষার জন্ম হয় মগধ অঞ্চলে, মাগধী প্রাকৃত থেকে। মাগধী প্রাকৃত থেকে মাগধী অপভ্রংশ ভাষার নিদর্শন সাহিত্যিক প্রাকৃতে আছে। কিন্তু মধ্যভারতীয় আর্যভাষার তৃতীয় স্তরে এই অপভ্রংশ ভাষা আরও খারাপ ভাবে ভাঙতে শুরু করে যার নাম হয় অবহট্ঠ বা অপভ্রষ্ট ভাষা। এটি হলো প্রাকৃতজনের ভাষা ভাঙার শেষ ধাপ। কথ্যভাষা হিসেবে এই অবহটঠের স্থিতিকাল আনুমানিক খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে দশম শতাব্দী অর্থাৎ চর্যাপদের কাল। সীমান্ত রাঢ়ী বাংলা তথা ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় চর্যাপদের অনেক লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যাবে। ছোটনাগপুরের বিভিন্ন ধরনের লোকভাষার বিচ্ছিন্নভাবে কিছু শব্দ ছাড়াও বিশেষ করে দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলায় বহড়াগোড়ার লোকভাষা : বহড়াগুড়িয়া / সুবর্ণরৈখিক / দেড়গুজরি / খিঁচড়ি (যা-ই বলি না কেন) বাংলাভাষার সঙ্গে তা অনেটা মিলে যায়। যেমন চর্যাপদের একটি পঙক্তি, ''যে যে আইলা তে তে গেলা'', বহড়াগুড়িয়া ভাষার সঙ্গে তো হুবহু মিল। আবার ত্রয়োদশ শতকের লেখা বড়ুচণ্ডীদাসের ''শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'' — এর ভাষার সঙ্গেও তার প্রচুর মিল আছে। চর্যাপদের কাল থেকে, বিভিন্ন শ্রেণির অবহট্ঠ ভাষা থেকে বিভিন্ন প্রকার নব্যভারতীয় আর্যভাষার জন্ম হয়েছিল। মধ্যভারতীয় আর্যভাষার তৃতীয় স্তরের আগে অপভ্রংশ ভাষা দুটি ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। পূর্বী প্রাকৃত আর পশ্চিমা প্রাকৃত। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে পূর্বী প্রাকৃতের গর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছিল বাংলা, ওড়িয়া আর অসমিয়া ভাষা এবং পশ্চিমা প্রাকৃত থেকে নেয় ভোজপুরী, মগহী আর মৈথিলি ভাষা। গ্রিয়ার্সন এই ভাষাগুচ্ছকে 'বিহারী' ভাষা নামে চিহ্নিত করেছেন। সূক্ষ্ম বিচারে এ ভাষাগুলির মধ্যেও একে অপরের মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে বিভিন্ন স্থানের ভাষাগোষ্ঠীর প্রভাবে একাধিক ভাষার জন্ম হতে পারে। অধুনা ঝাড়খণ্ডের বিশাল ভূখণ্ডে মাগধী ভাষাগুচ্ছের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে একগুচ্ছ অবহট্ঠ ভাষার জন্ম হয়েছে এবং পরিবর্তনসহ বহুকাল যাবৎ প্রচলিত হয়েও আসছে। পরে আগত এই আর্যভাষাগুলি এখানকার অন্-আর্যভাষার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ ও সান্নিধ্যে পরিবর্তিত হতে হতে এখনকার মতো রূপ লাভ করেছে। এই সব ভাষাগুলিকে ঝাড়খণ্ডী উপভাষার লেখক ড. ধীরেন্দ্রনাথ সাহা মহোদয় ''ঝাড়খণ্ডী উপভাষাগুচ্ছ'' নামে চিহ্নিত করেছেন। এরা হলো: নাগপুরী, খোরঠা, কুড়ামালী, সাদরী আর পাঁচপরগনিয়া। ড. বৈদ্যনাথ ত্রিপাঠী মহাশয় ঝাড়খণ্ডী বাংলা উপভাষাকেও এর অন্তর্গত করতে চান। কিন্তু ওই সব প্রত্যেকটি ভাষার অল্পবিস্তর প্রভাব ঝাড়খণ্ডী বাংলা উপভাষার বা সীমান্তরাঢ়ী বাংলা উপভাষার উপর পড়েছিল বলেই এক স্বতন্ত্র ঘরানার বাংলা উপভাষাটির মতো মিশ্র গড়ন হয়ে উঠেছিল। সেই আমলে আদি যুগের সাহিত্যিক নিদর্শন চর্যাপদটির প্রসঙ্গেও একইরকম ঘটেছিল। অর্থাৎ পরবর্তীকালে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মিলেমিশে এক প্রকার বিশেষ আঞ্চলিক ঘরানার ভাষার জন্ম হয়েছিল। চর্যাপদের 'অইসন' (এমন / এরকম) কুড়মালীতেও প্রযুক্ত হয়, নাগপুরী-পাঁচপরগণী, খোরঠাতেও প্রযুক্ত হয়। 'জইসন' (যেমন / যেরকম) শব্দের প্রয়োগ কুড়মালিতেও হয় আবার নাগপুরীতেও হয়, খোরঠাতেও হয়। মালভূমির পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকের সমতলভূমিতে নামতে নামতে এ ভাষায় ক্রমশ সেই প্রভাব ক্ষীণতরও হয়ে এসেছে ঠিক বিলিয়মান লোকসংস্কৃতির অনেক কিছুর উপাদানের মতো। অবশ্য তখন আর প্রাচীন রাঢ়সংস্কৃতির শেকড়ের অনুসন্ধান করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এই ঘটনা শুধু বাংলার ক্ষেত্রেই ঘটেছে এমন নয়। ভোজপুরী, মৈথিলি, অসমিয়া এবং ওড়িয়া ভাষার ক্ষেত্রেও ঘটেছে যার ফলে চর্যাপদ কেবল বাংলাভাষার আদি নিদর্শনই নয়, চর্যাপদের দাবিদার উপরোক্ত সব ভাষাগুলিই, এমনকি হিন্দিরও। পাটলিপুত্র, মগধ এবং অধুনা ঝাড়খণ্ডের ছোটনাগপুরের ভাষা পরিবেশের প্রক্ষাপটে সীমান্তরাঢ়ী বাংলা তথা ঝাড়খণ্ডী বাংলার বিকাশ আবার রূপান্তরও। এই ঐতিহ্যকে আমরা যেন ভুলে না যাই। এ ভাষা পূর্ব দিকে (উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব) অগ্রসর হওয়ার সময় অবহটঠের খোলস ক্রমশই ত্যাগ করে শিষ্ট বাংলার সঙ্গে মিশে যেতে চেয়েছে।

পশ্চিম সীমান্ত রাঢ় ঝাড়খণ্ডের প্রাচীন ভাষাটির নাম নাগপুরী ভাষা। ছোটনাগপুর ছাড়াও এ ভাষা বিহার,ওড়িশা, ছত্রিশগড়, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, অরুণাচল প্রদেশ, আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, আবার দিল্লি, মুম্বাই, ব্যাঙ্গালোরেও অল্পবিস্তর প্রচলিত আছে। অতএব এ ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রফল বিস্তৃত। তেমনি এ ভাষার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে চর্যাপদের কালকেই চিহ্নিত করা হচ্ছে। খ্রিস্টাব্দ সপ্তম-অষ্টম শতক থেকে এগার শতাব্দীর মধ্যে নাগপুরী ভাষার উন্মেষকাল বলে গবেষকদের অভিমত। আর তার প্রচলন বিকশিত হবার সময়কাল চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত। এই ভাষারও উদ্ভবের পিছনে আছে মাগধী অপভ্রংশ। মাগধী অপভ্রংশ থেকে যেভাবে বাংলা, উড়িয়া, মৈথিলী, ভোজপুরী, মগহী ভাষাগুলির উদ্ভব হয়েছিল, নাগপুরী ভাষার ক্ষেত্রেও তদ্রুপ ঘটেছে। নাগপুরীর সঙ্গে তাই উপরোক্ত ভাষাগুলির আন্তঃসম্পর্ক আবিষ্কার করা যায় সহজেই। ভোজপুরীর সঙ্গে নাগপুরীর অসম্ভব মিলের দরুন অনেকে নাগপুরী

ভাষাকে ভোজপুরী ভাষার বি-ভাষা রূপে চিহ্নিত করতে চান। ঝাড়খণ্ডে সর্বপ্রথম অসুর বা অনার্য জাতির বসবাস ছিল বলে উল্লেখ করা হচ্ছে। এরপর আসে বহিরাগতরা। এদের মধ্যে বহিরাগত নাগজাতির ইতিহাস সপ্তদশ শতাব্দীর। মাদরা মুণ্ডার শাসনকালের পর ছোটনাগপুর শাসন করেন নাগবংশী ফণীমুকুট রায় (1983-14 August 1947) । এঁরা বহিরাগত তাই তাঁদের সাদান বলে চিহ্নিত করা হয়। আদিবাসীরাই এই নাম দেন। ঝাড়খণ্ডে তখনো বহু প্রকার আদিবাসীদের বাস। কিন্তু ভাষার ক্ষেত্রে যেটি ঘটল তা এই যে, আদিবাসীদের ভাষার সঙ্গে সাদানের ভাষার বিমিশ্রণ ঘটে গেল। মিশ্রণ হয়ে এক বিশেষ প্রকার সম্পর্ক-ভাষার (lingua franca) উৎপন্ন হলো, যা সদানি, সদান, সাদরি প্রভৃতি বিভিন্ন নামে চিহ্নিত হয়ে গেল। রাজভাষার প্রভাবে বহু আদিবাসীদের ভাষাও হয়ে গেল সাদানি বা সাদরি; তারা নিজেদের ভাষা ভুলেও গেল। ফলে নাগপুরী ভাষার মধ্যে মুণ্ডা, ওরাওঁ, খেড়িয়া, চিক-বড়াইক, লোহরা / লোহার / ঢিকার, বীরহোড় প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার আদিম ভাষার মিশ্রণ ঘটে গেল। সেইসময় এই সব জাতিগুলির সঙ্গে একত্রে মিলেমিশে বাস করার ফলস্বরূপ ঝাড়খণ্ডে একটি প্রবাদের জন্ম হয়েছিল। সেটি হলো: ''হড় সাদান আদান-প্রদান / হিতমিতান ফুলপরান।'' হড় হচ্ছে আদিবাসী আর সাদান হচ্ছে অনাদিবাসী লোক। তাদের পারস্পরিক ফুল-পরাণ সম্পর্ক স্বাভাবিক ভাবে সংস্কৃতির অন্যান্য প্রভাবের মতো ভাষার ক্ষেত্রেও পড়ল। 'Journal of Tribal and Regional Language vol. 1' গ্রন্থে ড. কুমারী বাসন্তী জানিয়েছেন, নাগপুরী হলো আর্যভাষার ঔরস-সন্তান, যার উৎপত্তি মধ্যকালীন ভারতীয় আর্যভাষার মাগধী অপভ্রংশ থেকে হয়েছে। 'নাগপুরী লোকসাহিত্য' গ্রন্থে ড. ভুবনেশ্বর অনুজ একই কথা বলেছেন। তাঁর মতে ঝাড়খণ্ডের নাগপুরী ভাষা অত্যন্ত প্রভাবশালী, ব্যাপক অস্তিত্ব-সম্পন্ন ও স্বতন্ত্র এবং তিনি এও জানিয়েছেন যে, অনেকগুলি প্রাচীন ভাষা নাগপুরী ভাষার সঙ্গে মিলেমিশে আলাদা আলাদা প্রাকৃত ভাষার জন্ম দিয়েছিল। তাঁর মতে, সদান, সদানি, সাদরি, কুড়মালি, খোরঠা এমনকি পাঁচপরগণিয়া ভাষাও। তাঁর পরিষ্কার বক্তব্য, সেদিন দ্রাবিড় আর অস্ট্রিক ভাষার সংস্পর্শে নাগজাতির ভাষা নাগপুরী বিকশিত হলো। যদিও শতকরা হিসেবে পরবর্তীকালেও নাগপুরী ভাষায় সত্তর শতাংশ আদিবাসী ভাষাগুলির প্রভাব খুঁজে পেতে অসুবিধে হয় না। ড. বিশেশ্বরপ্রসাদ কেশরীও তাঁর 'নাগপুরী ভাষা মাগধী অপভ্রংশ' পুস্তকে নাগপুরী ভাষার উন্মেষকাল খ্রিস্টাব্দ সপ্তম শতক থেকে এগার শতকের মধ্যবর্তী বলে উল্লেখ করেছেন। নাগপুরী ভাষায় অপিনিহিতি'র প্রয়োগ ব্যাপক আইজ (আজ), জাইত (জাতি) আখছার ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। ঝাড়খণ্ডী বাংলায় অবশ্য এই / ই কার ধ্বনি অর্ধেক উচ্চারিত হয়। বোঝা যায় ভাষাতাত্ত্বিক ড. ধীরেন্দ্রনাথ সাহার অপিনিহিতি সম্পর্কে প্রবন্ধটি লেখার পিছনে খোরাক জুগিয়েছিল এই ছোটনাগপুরের ভাষাপরিবেশ। ড. গিরিধারীরাম গঞ্জু তাঁর বইতে জানিয়েছেন, নাগপুরী যে ভূখণ্ডের ভাষা, সেখানে নাগজাতির প্রধানের কারণে এই ভূখণ্ডকে — নাগদেশ, নাগদিসুম, নাগখণ্ড, হীরানাগপুর, সোনানাগপুর, সুতিয়ানাগপুর, চুটিয়ানাগপুর, ছোটানাগপুর, ছোটনাগপুর হতে হতে অবশেষে আজ ঝাড়খণ্ড নামে পর্যবসিত হয়েছে। এই ঝাড়খণ্ডের পূর্ব প্রান্ত (উত্তর-পূর্ব আর দক্ষিণ-পূর্ব) রাঢ়বাংলার ভাষা-সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র; যার সামাজিক, রাজনৈতিক, ভাষাতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক, সবদিক থেকেই সীমান্ত রাঢ়বঙ্গের সংস্কৃতির উপর প্রভাবগত অবদান রয়েছে। এখন কিছু নাগপুরী ভাষার ধাতুরূপের উল্লেখ করা হলো। যেমন, জা, খা, পী, উঠ, বইঠ, মর, জী, পঢ়, লিখ, বোল, সুন (শুন), গা, বজা, কহ, নাচ, ঠেল, খোল, ঢাপ, সুত (সো), ছুট, দেখ, ভেজাল, লা ইত্যাদি ইত্যাদি। দু-একটি বাক্য, যেমন, 'আপনি আমার মামা', নাগপুরীতে হবে: 'তোহরে মোর মামা হেকা।' এই মধ্যম পুরুষের সর্বনাম 'তোহরে' চর্যাপদে আছে। 'এই ঘর বড়ো', নাগপুরী ভাষায়, 'ই ঘর বড় আহে' এখানে 'আহে' আসলে 'আছে' ইত্যাদি। বাংলাভাষার সঙ্গে যোগসূত্র ধরিয়ে দেওয়াই আমার এই গবেষণার উদ্দেশ্য, যা কেউ আলোচনা করার প্রয়োজন অনুভব করেন নি। পশ্চিম রাঢ়ী বাংলা ভাষা-সংস্কৃতির উৎপত্তির হদিস ছোটনাগপুরের মালভূমির মধ্যেই পাওয়া যাবে — এ বিষয়ে আমার দৃঢ় অভিমত।

এখন সাদরি ভাষার ইতিবৃত্ত সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো, সদানি বা সাদরি বা নাগপুরী ভাষা সমগ্র ঝাড়খণ্ডকে এক করে জুড়ে নেওয়ার ভাষা। আসলে একটি সম্পর্ক ভাষা তবে নাগপুরীতে যতোটা অস্ট্রিক আর দ্রাবিড় ভাষার প্রভাব সাদরিতে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়েছে। সাদরি ভাষা চতুঃপার্শ্বে সীমান্ত ভাষাগুলির আধারে রূপ বদল করেছে। উত্তর প্রান্তে মগহীর সঙ্গে, পূর্বদিকে বাংলা ভাষার সঙ্গে, দক্ষিণ দিকে ওড়িয়া ভাষার সঙ্গে আর পশ্চিমদিকে ছত্রিশগড়ী'র সঙ্গে প্রভাবিত হয়েছে। পূর্ব দিকের সাদরি ভাষাটি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রাঢ়ী উপভাষা বাংলার কাঠামোটিকে নির্মাণ করতে সাহায্য করেছে। অতএব কেন্দ্রীয় নাগপুরী সংরক্ষিত আছে রাঁচি অধ্যুষিত ছোটনাগপুরের মাঝখানে। অনেকে মনে করেন, সদান অর্থাৎ বাইরে থেকে আসা মানুষদের বসবাস করা আদিবাসীদের সঙ্গে সদরে পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের ভাষার নাম সাদরি। ড. বৈদ্যনাথ ত্রিপাঠী জানিয়েছেন, অতি সংক্ষেপে সদান শব্দের অর্থ মূলবাসী বা অধিবাসী। তাঁর ভাষায়, ''ঝাড়খণ্ডের যে আর্য সম্প্রদায় দীর্ঘকাল ধরে অস্ট্রিক গোষ্ঠীর পাশাপাশি বসবাস

করেছে, তারাই সদান বা সাদান''। তাহলে এদের মূলবাসী বলাটা কী উচিত হবে? ঝাড়খণ্ডে সাদরি ভাষাটি সদানি, গঁওয়ারি, গঁওলি, সদরি, সাদরি প্রভৃতি বিভিন্ন নামে জানা যায়। নাগপুরীর সঙ্গে তার সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। অধ্যাপক শ্রবণকুমার গোস্বামী মহাশয় জানিয়েছেন, যখন কোনো আদিবাসী নিজের ভাষা ছেড়ে নাগপুরী ভাষাকে গ্রহণ করেছে তখন ওই নাগপুরী ভাষার উপর নিজের ভাষার প্রভাব প'ড়ে এক বিশেষ প্রকার নাগপুরী ভাষার জন্ম দিয়েছে। এই প্রকার নাগপুরীর নাম সাদরি ভাষা। ঝাড়খণ্ডে এই সাদরি হলো একপ্রকার সম্পর্ক-ভাষা। একটি সাদরি ভাষার নমুনা:

''বন পাহাড় পোড়ে সেকে সব কেউ দেখে না রে, / ভিতরে কলেজা জ্বলে কেউ নি তো জানে।'' তখন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রাধার অন্তর্জ্বলার কথা মনে পড়ে না কি? — ''বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানি / মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পনি।।'' অথবা, ''জিয়ব কতেই দিন / অবকি মিলন আহে কঠিন।'' অথবা 'আমি যাব' সাদরিতে বলা হচ্ছে: 'মোএঁ জামু বা জাবোঁ'। এ সব ক্ষেত্রেই মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষার ঠাট বহাল রয়েছে। এইরকম ভাবে, তুমি হল / তোএঁ, / সে হল / উ /, দেখা হলো / দেখেক /, জাগা হল / জাগেক /, শোনা গেল হলো / শুনেক / ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে কতকগুলি শব্দের লক্ষণ বাংলা থেকে আলাদা। যেমন মা হলেন, / আয়ো /, দাদু— / আজা /, ছটফট করা — / উফড়েক/, পরীক্ষা — / বিয়ের /, ঘাবড়ে যাওয়া — / অকবকাএক /, সজোরে হাঁটা — / তিরতিরাল /, নোঙরা — / ঘিনঘিনা /, ভীতু — / ডরপোক /, কাঁপুনি — / ঠুরঠুরাএক / ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সাদরি ভাষার প্রভাব সীমান্ত রাঢ়ী বাংলা উপভাষার উপর পড়েছে তা বেশ বোঝা গেল।

রাঁচির আশপাশের আরেক সম্পর্ক ভাষার নাম পাঁচপরগণীয়া ভাষা। শুরুর দিকে রাঁচিজেলার সিল্লি, সোনাহাতু, রাহে, বুন্ডু আর তামার এলাকার মধ্যে এ ভাষার প্রচলন ছিল ধরে নিয়ে পাঁচপরগণীয়া নামকরণ করা হয়। জর্জ গ্রিয়ার্সন সাহেব কেবলমাত্র তামাড় এলাকার মধ্যেই এই ভাষার রূপ দেখেছিলেন, তাই তিনি এই ভাষার নাম দেন 'তমাড়িয়া' ভাষা । পরে ড. বিশ্বেশ্বরপ্রসাদ কেশরী পাঁচপরগণা ক্ষেত্রকে বৃহৎ বলে উল্লেখ করেছেন কিন্তু এই ভাষাকে নাগপুরী ভাষারই এক রূপ বলে উল্লেখ করেছেন। ড. উদয় নারায়ণ তেওয়ারিজী তাঁর ''ভোজপুরী ভাষা আর সাহিত্য'' গ্রন্থে বললেন, পাঁচপরগণীয়া বুলি আর ভোজপুরী একই রূপের। এর আগে তিনিই আবার পাঁচপরগণীয়া ভাষাকে মগহী'র বি-ভাষা বলে উল্লেখ করেছেন। জর্জ গ্রিয়ার্সন মগহী, ভোজপুরী আর মৈথিলি ভাষাকে ''বিহারী'' ভাষা নামে চিহ্নিত করেছেন ও পাঁচপরগণীয়া ভোজপুরীর বি-ভাষা রূপে চিহ্নিত করেছেন। প্রত্যেকেরই অভিমত মাগধী অপভ্রংশ থেকেই অন্যান্য ভাষাগুলির মতোই পাঁচপরগণীয়ার প্রাচীন সাহিত্যের উৎপত্তি এবং বিকাশ হয়েছিল। শ্রী জ্যোতিলাল মহাদানী এ ভাষার ক্ষেত্র পাঁচপরগণা ছাড়াও মানভূম আর সিংভূমকেও চিহ্নিত করেছেন। অতএব বোঝা যাচ্ছে এই ভাষাটির ওপরও অন্যান্য ভাষার প্রাচীনত্ব ও প্রভাব যথেষ্ট বর্তমান রয়েছে। পাঁচপরগণা এলাকায় যারা বসত করে তারা হলো: মুন্ডা, ওরাওঁ, সাঁওতাল, হো, খাড়িয়া, বীড়হর, সুড়ি, বেনে, লোহার, মাহালি, ঘাসি, ডোমেইন, ধোপা, গোসাঁই, বামন, কুইড়ি, কুমহার, বাড়াইক, তেলি, বেদে, মাহাত, রাজপুত্র, অসুর, ভূমিজ, বিরজিয়া, মলতো, নাপিত ইত্যাদি ইত্যাদি জাতির বসবাসকারী মানুষ। এইসব জাতিগুলির পৃথক পৃথক ভাষা ছিল। কিন্তু হাটে-বাজারে-সদরে সবপ্রকার ভাষা মিলেমিশে এক বিশেষ প্রকার ভাষার রূপ ধারণ করলো, যা পাঁচপরগণীয়া ভাষার রূপে আর নামে পর্যবসিত হল। তবে আপন আপন ক্ষেত্রে এ ভাষার আলাদা আলাদা নাম। যেমন : কোথাও খেড়ওয়ি, কোথাও গঁওয়ারি, কোথাও সাদানি / সাদরি আবার কোথাও এর নাম দিকুকাজি, তমাড়িয়া অথবা পাঁচপরগণীয়া। এই ভাষার আরেক নাম খিচুড়ি ভাষা। কালে কালে এ ভাষাই বাংলা, ওড়িয়া, সাঁওতালি প্রভৃতি ভাষার মধ্যেই লীন হতে চেয়েছে। পাঁচপরগণার মানুষের মুখের বুলি, ভাষা, আচার-বিচার, রহন-সহন, খান-পান, ঘর-দুয়ার, আকার-প্রকার, গীত-সংগীত, পরব-তোহার, পুজো-পাসা, গাজা-বাজা, নাচা-কোদা প্রভৃতি লক্ষ করলে দেখা যাবে স্বতন্ত্রতার মধ্যেও এ ভাষার একপ্রকার বিশেষ ঐক্য বর্তমান রয়েছে। যেমন একটি উদাহরণ পাঁচপরগণীয়াতে এবং বাংলায় ''আখড়া''কে মুন্ডারি ভাষায় বলা হয় ''অখড়া'', ওড়াওঁরা বলে ''আকড়া'' আর সাঁওতালিতে বলা হয় ''অকড়া''। বাক্য দিয়ে উদাহরণ দিই যেমন, ''তোমার পেটও ভরল না''— এই বাক্যটি পাঁচপরগণীয়া ভাষায় বলা হবে, ''তর ঢঢ়াও নি ভরলক।'' কুড়মালিতেও পেট-কে 'ঢঢ়ড়' বলা হয়। এইরকম যদি বলা হয় — ''তোমার পেট খুবই খালি আছে'', তাহলে পাঁচপরগণীয়াতে বলা হবে: ''তর ঢঢ়ড়ে ঢামনা ঢুইক আহে।'' মানে, তোর পেটে ঢেমনা সাপ ঢুকে আছে। ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষা। পাঁচপরগণীয়ার সঙ্গে ঝাড়খণ্ডী বাংলা তথা কুড়মালি ভাষার সঙ্গে অনেক মিল পাওয়া যাবে। যেমন একটি বিয়ের গান, যেখানে নববিবাহিতা কন্যাটি তার বিয়ের দুঃখজনক পরিণাম তার বাবার কাছে বলেছে:

''পাহাড়ে-পর্বতে পাডইর জমকয়ে / বাবা ক আঁখে নীদ নাহি রে / বাবা ঝুঠা পতরি রকম ফেঁকলে / এবে বাবা সুখ নীদ রে।।'' ইত্যাদি। লোহরা বা ঢিকারদের ঝুমুর গীতগুলিও এ ভাষার উদাহরণ। চর্যাপদের ভাষা যদি বাংলা হয় তাহলে পাঁচপরগণীয়া

ভাষার বিন্যাস ততোধিক বাংলার, ঝাড়খণ্ডী বাংলার নিদর্শন সন্দেহ নেই।

এযাবৎ কুড়মালি ভাষাকে কুড়মি-মাহাত জাতির ভাষা বলেই প্রচার করা হয়েছে। বাংলা, ওড়িয়া, অসমিয়া, মৈথিলি আদি জাতির সঙ্গে জাতিগত-ভাষার যোগসূত্রের মতো কুড়মালি জাতির ভাষা কুড়মালিকে কুড়মি-মাহাত সমাজ নিজেদের ভাষার পরিচয় দিয়ে দাবি করে থাকে। আবার কুড়মালি নামের আখ্যা দিয়ে স্বতন্ত্র ভাষার জন্য আন্দোলন করে চলেছে তারা যদিও অন্যান্য আরো অনেক জাতি আছে, যারা উক্ত সীমান্ত অঞ্চলে কুড়মালি ভাষায় কথা বলে থাকে। আসলে সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক থেকে এই ভাষা লালন এবং পালনে কুড়মি-মাহাত সমাজের জনসংখ্যা বেশি। কুরমি শব্দের সঙ্গে আলি প্রত্যয় যোগে কুর্মালি বা কুড়মালি শব্দটির উৎপত্তি। কিন্তু এই জাতিটির প্রাচীনত্ব প্রমাণ করতে কুড়ুম শব্দের সঙ্গে আলি প্রত্যয় যোগ করা উচিত। অস্ট্রিক ভাষাভাষী মানুষের পাশে এই জাতিটি বহুকাল আগে থেকেই বসবাস করে আসছে। এই কথার প্রমাণ আজও তাদের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যে নানান ভাবে খুঁজে পাওয়া যাবে। যেমন কুড়মি সমাজের মেয়ের বিয়েতে একজন আদিবাসী ভাইয়ের প্রয়োজন পড়ে। এরা মূলত আদিম জনজাতিই ছিল। বিশ শতকের তিনের দশকে এরা রাজপুত বলে প্রমাণ করতে চায় এবং তারা ব্রিটিশ আমলেই জনজাতি থেকে লিখিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বেরিয়ে আসে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই কুড়মি-মাহাত জনজাতিটি এস.টি.র তালিকা থেকে বাদ যায়। আজ আবার জাতি সত্তার অস্তিত্বের সংকটে এস.টি.র পরিচয় লাভ করবার জন্য এরা নিয়মিত আন্দোলন করে চলেছে। এরা সাঁওতাল-মুণ্ডাদের সঙ্গে বহুকাল আগে থেকেই জঙ্গল মহালের এপার-ওপার বসবাস করে আসছে। ছোটনাগপুর, পশ্চিমবঙ্গের খড়্গপুর আর ওড়িশার সীমান্তে এদের বাস। জর্জ গ্রিয়ার্সন সাহেব তৎকালীন মানভূম, খরসঁআ, সরাইকেল্লা, রাঁচি এবং ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ-কেঁওঝর, বোনাই, বামড়া প্রভৃতি এলাকায় কুড়মালি ভাষার প্রচলন আছে বলে চিহ্নিত করে গেছেন। রাঁচির ছোটনাগপুর আর পাঁচপরগণা অঞ্চলও এই ভাষার আওতায় পড়ে। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, মালদা, দিনাজপুর আর ঝাড়খণ্ডের রাঁচি ছাড়াও ধানবাদ, বোকারো, রামগড়, হাজারিবাগ, জামশেদপুর, পালামৌ, সিংভূম (পূর্ব আর পশ্চিম), চাতরা, গোড্ডা, দেউঘর জেলা আর বিহারের সীমান্তেও এই ভাষার ব্যাপক প্রচলন আছে। তবে কুর্মি-মাহাতদের ছাড়াও যেসব বৃহত্তর সমাজ-উপসমাজ এই ভাষায় কথা বলে তারা হলো: কাহার, কুমোর, রাজওয়ার, রাজপুত, গোয়ালা, নাপিত, ধোপা, মুচি, নওয়া, বাউরি, হাড়ি, ঘাসি, ডোম, কামার, তাঁতি, তেলি, বেনে, সুঁড়ি, বামন, সোনার, ভূমিহার এবং কোথাও কোথাও সন্নিহিত আদিবাসীও। অতএব কুড়মালি ভাষা কেবল কুড়ুমি-মাহাত জাতিটিরই একমাত্র ভাষা নয় যদিও জাতিগত নামকরণ থেকে এ ভাষার দাবি কুড়মি বা মাহাত সম্প্রদায়ই করে আসছে আদিকাল থেকেই। গ্রিয়ার্সন সাহেব এই ভাষার নাম দিয়েছেন 'কুড়মি ঠার'। এই ভাষাটির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে বলা হচ্ছে এ ভাষার আদিযুগ ১৭৫০ সালের আগে থেকে। যদিও এই সময়ের কোথাও কোনো সাহিত্যের নিদর্শন ছিল না, মৌখিক সাহিত্য অবশ্য ছিল। অহীরা, টুসু ইত্যাদির প্রাচীন গীতগুলিতে খাঁটি কুড়মি ভাষার কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যাবে যদিও এ ভাষাকেও ঝাড়খণ্ডী বাংলাই বলা উচিত। তবে কুড়মালি ভাষার প্রাচীনত্ব অনেক পুরাতন হবার সম্ভাবনা। কুড়মালি ভাষার উপর ঝাড়খণ্ডী বাংলার প্রভাব অনেক। ভাষাতাত্ত্বিক ড. ধীরেন্দ্রনাথ সাহা মহাশয় জানিয়েছেন, পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে যেতে যেতে কুড়মালি ঝাড়খণ্ডী বাংলার সঙ্গে লীন হয়ে গিয়েছে। আবার ড. মঞ্জয় প্রামাণিক তাঁর ''খাঁটি কুড়মালী'' পুস্তকে জানিয়েছেন, ''বাংলা ভাষা কুড়মালীর সঙ্গে মিলেমিশে বিকশিত হয়ে গেছে। মোটামুটি সবমিলে বলা যায় যে, বর্তমানে কুড়মালী ভাষা থেকে বাংলাকে পৃথক করা সম্ভব নয়।'' আসলে যেভাবেই বলা হোক না কেন, এটি নিশ্চিত যে, পূর্বদিকে কুড়মালি ভাষা মার্জিত হতে হতে ঝাড়খণ্ডী বাংলার রূপ পরিগ্রহ করেছে। তাই পশ্চিম ছোটনাগপুর মালভূমির একান্ত সীমান্ত সংলগ্ন কুড়মালীর সঙ্গে সীমান্ত রাঢ়ী বাংলা উপভাষার পার্থক্য করাটা খুব মুশকিল। আসলে পার্থক্য হয় না। তাই একমাত্র ড. সুধীরকুমার করণ, ছাত্র ভাষাতাত্ত্বিক ড. ধীরেন্দ্রনাথ সাহা প্রদর্শিত এবং অধ্যাপক ড. সুকুমার সেন সমর্থিত ও কথিত ঝাড়খণ্ডী বাংলা উপভাষার নামের সমর্থন করেন নি। তৎকালীন অখণ্ড রাঢ়ের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে তার নাম দিয়েছিলেন ''সীমান্ত রাঢ়ী বাংলা উপভাষা''। ঝাড়খণ্ডী বাংলা ভাষাকে তাই কুড়মালি ভাষা বলা উচিত নয়, কিন্তু আধুনিক যুগের কুড়মালি ভাষাকে ঝাড়খণ্ডী বাংলা অনায়াসেই বলা চলে। ঝাড়খণ্ডী বাংলা উপভাষার অন্তর্গত হলো একটি কুড়মালি উপভাষা। এখনকার মাহাতরা বেশিরভাগই কুড়মালি ভাষা জানে না, এ কথা বয়স্ক মাহতরা অনেকেই আমাকে জানিয়েছেন। শুধু ''অইসন-জইসন'' কথা কুড়মালি ভাষাতেই নয়, অন্যান্য ভাষাগুলির ক্ষেত্রেও লক্ষ করা তবে সুদূর হাজারিবাগের অরণ্য সংলগ্ন এলাকায় এখনও খাঁটি কুড়মালির চল রয়েছে, যা শুনে অনেক কথা বুঝে ওঠা মুশকিল হয়ে যায়। যেমন: কুড়মালি ভাষার ভৌগোলিক সীমা নির্ধারণ করতে কুড়মালি ভাষায় বলা হচ্ছে: ''কুড়মালী একটা অন্তর প্রান্তীয় ভাসা হেকেইক। কুড়মালী কর একটা আহনা আহেইক জে বেজাঁই নামকরা হেকেইক — 'সিখ সিখর নাগপুর আধা আধি খড়্গপুর' মাহান একর সীমানা দেখাওল গেল আহেইক। একর মানে

ওড়িশা, ছোটানাগপুর আর পশ্চিম বাংলা কর খড়্গপুর তক একর সীমানা আহেইক।" এ ভাষা পশ্চিম সীমান্তের পূর্ব প্রান্ত স্পর্শ করতে করতে সহজ হয়ে ঝাড়খণ্ডী বাংলাকেই পরিপুষ্ট করেছে। যেমন, 'ছবাটা জাই সাহে' মানে ছেলেটি যায়। তেমনি, ঘোড়া জাইস মানে হলো, ঘোড়া যাচ্ছে। আরো সহজ হয়েছে দেখুন। গাছে কাঁঠাল ঠোঁটে তেল — এই প্রবাদটি কুড়মালিতে বলা হবে: গাছে কঠহর অঠে তেল। তেমনি বলা হয়: "নাচে নি জানে আর মাদরিয়া কর দোষ।" এর মানে হলো: "নাচতে না জানলে উঠোনের হয় দোষ।" ইত্যাদি। বর্তমানে মানসিকভাবে ভিতরে ভিতরে ঝাড়খণ্ডের প্রক্ষাপটে কুড়মালি জাতিগোষ্ঠী ঝাড়খণ্ডী বাঙালি থেকে নিজেদের তফাৎ করে নিচ্ছে। ফলে জামশেদপুরে কুড়মালিদের "আমরা বাঙালি" নামের অত্যন্ত পরিচিত এবং সমর্থ সংগঠনটির অস্তিত্ব আজ বিপন্ন হয়ে গেল। তাছাড়া ঝাড়খণ্ডের বাংলা ভাষার উপর চিড়ও ধরে গেল। মাহাত-কুড়মি জাতি একসময় নিজেদের রাজপুত বলে পরিচয় দিয়ে জাতে উঠতে চেয়েছিল। তবে ঝাড়খণ্ডী বাংলা ভাষার অস্তিত্ব, বিকাশ আর সংরক্ষণের ইতিহাসে কুড়মি-মাহাতদের অনেক অবদান রয়েছে। ড. বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত মহাশয়ের একটি "ঝাড়খণ্ডী বাংলা অভিধান" আছে। এই অভিধানকে কুড়মালি অভিধান বলে প্রচার করা হচ্ছে। আমাদের প্রশ্ন: জোর করে তা প্রমাণ করতে গেলে ঝাড়খণ্ডী বাংলা উপভাষার উপর কোপ বসানো হবে / হচ্ছে। মনে রাখতে হবে ঝাড়খণ্ডী বাংলা উপভাষার ক্ষেত্র কেবলমাত্র ঝাড়খণ্ড অঞ্চলই নয়, সীমান্ত পেরিয়ে পূর্ব দিকে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেও প্রবাহিত। এর অবদান ছোটনাগপুর অঞ্চলের ঐ কুড়মালি ভাষাটিরও অপেক্ষা রাখে।

খোরঠা ভাষা ঝাড়খণ্ডের অনেক বড়ো ভূখণ্ডে প্রচলিত। এই আবাদী ক্ষেত্র পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক জাতি-ধর্ম-সমুদয়, পেশার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আধারে পরিবেষ্টিত। এইসব ক্ষেত্রগুলির নাম, যেমন: ১. সিখরিয়া (বোকারো জেলার চাস-চন্দনকিয়ারি ইত্যাদি)। ২. গোলবারী (গোলা থেকে পেটরবার-কসমার ইত্যাদি)। ৩. দেশবালী (পতরাতু থেকে পশ্চিম লাতেহার আদি)। ৪. দেওঘরিয়া (দেওঘর, দুমকা, জামতাড়া, গোড্ডা, সাহেবগঞ্জ, আদা উত্তর-পূর্ব ক্ষেত্রেও)। ৫. পারনদিয়া (দামোদরের উত্তর ক্ষেত্রে)। ৬. গাঢ়ী (পেটরবার-গোমিয়া থেকে পরেশনাথ পর্যন্ত)। ৭. উপরঘটিয়া (ওরমাঝি, কাঁকে, বুঢ়মু, পিঠোরিয়া ইত্যাদির ক্ষেত্রে)। ওদিকে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম আর আন্দামান-নিকোবরেও প্রচলিত আছে। এই খোরঠা ভাষার লিখিত সাহিত্যের আদিযুগ ১৭৫০- ১৯০০ সাল পর্যন্ত ধরা হয়েছে।

গবেষকদের মধ্যে কেউ কেউ কেউ এই খোরঠা ভাষার প্রচলন ভারতের প্রাচীতম সভ্যতা সিন্ধু সভ্যতার সময়কাল থেকে ধরতে চেয়েছেন। তাঁদের মতে ভাষার নাম খোরঠা'র আর তার লিপির নাম হলো: 'খরোষ্ঠী'। ডা. বি. এন ওহোদার বলেন, খোরঠা ভারতের প্রচীনতম লোকভাষা। তাঁর মতে, সোজাসুজি প্রাকৃত ভাষা থেকে এ ভাষার উৎপত্তি। যার মধ্যে অস্ট্রিক গোষ্ঠীর মুন্ডারি, সাঁওতালি আর দ্রাবিড় গোষ্ঠীর কুড়ুখ (ওড়াওঁ) প্রভৃতির প্রভাব আছে। প্রফেসর নরেশ নীলকমল অপভ্রংশ থেকে খোরঠা ভাষার উদ্ভব বলে রায় দিয়েছেন। ড. গঙ্গাধর মাহাত বলেন, খোরঠা ভাষার বিকাশ মাগধী অপভ্রংশ থেকেই হয়েছে। কৃষ্ণচন্দ্র দাস আলা খরঠী>খরঠা — এইরকম বিবর্তন প্রকৃতি থেকে নিঃসৃত হয়ে সাধারণ মানুষের মুখের উচ্চারণ নির্গত হয়েছে বলে মনে করেন। কেউ কেউ অপভ্রংশের পর অবহট্ঠ তারপর খোরঠা'র উৎপত্তির কথা বলেছেন। এই ভাষাকে কয়েকটি নামে জানা যায়, যেমন: মুচিয়ালি, ডোমালি, কুরমিয়ালি। এই ভাষাকে কেউ কেউ ইতর, অশিষ্ট, কর্কশ মেনে নিয়ে এর নাম খোট্টা ছিল বলে মনে করেছেন আর এই খোট্টা থেকেই খোরঠা হয়েছে বলে মনে করেছেন। যাই-ই হোক এই প্রাচীন ভাষাটিও যে পশ্চিম সীমান্ত রাঢ়ী বা ঝাড়খণ্ডী বাংলা উপভাষার উপর প্রভাব ফেলেছিল, এ বিষয়েও সন্দেহ করা উচিত নয়। এ ভাষার সামান্য নমুনা : হামেঁ খইলোঁ (আমি খেলাম), সোহন গেলই (সোহন গেল), ঋতু লিখইত হতই (ঋতু লিখছে হয়তো) এইরকম। সুতরাং খোরঠা'র সঙ্গেও ঝাড়খণ্ডী বাংলার আত্তীকরণ ঘটেছে।

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি, পশ্চিম সীমান্ত বাংলার রাঢ়ী উপভাষার উপর তৎকালীন ঝাড়খণ্ডের একগুচ্ছ প্রাকৃত ভাষার প্রভাব পড়েছিল। আর এও অনুভব করার বিষয় যে, এই ঝাড়খণ্ডী বা সীমান্ত রাঢ়ী বাংলা উপভাষা পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে প্রসারিত হতে হতে তার আদিরূপের খোলস ত্যাগ করেছে আর ক্রমশ সু-সংস্কৃত হয়ে উঠেছে বঙ্গের রাঢ়ী উপভাষার প্রবল চাপে। শিষ্ট বাংলার সঙ্গে এ ভাষা মিশে যেতে চেয়েছে। ধাপে ধাপে ক্রমশই মার্জিত হতে চেয়েছে সীমান্ত বাংলার রাঢ়ী উপভাষা এবং সীমান্ত রাঢ়ী বাংলার সংস্কৃতি।

গ্রন্থপঞ্জি:

১। আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলার লোকসংস্কৃতি', ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, পুনর্মুদ্রণ ১৯৮২
২। গিরিধারী গোঞ্জুরাম, 'নাগপুরী সিখেঁ ঝাড়খণ্ড ঝরোখা', রাঁচি, ২০১৩
৩। দিনেশকুমার, 'টোটাল খোরঠা', শিবাঅঙ্গাণ পাবলিকেশন, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০২২
৪। দিনেশকুমার দিনমণি, 'আধুনিক খোরঠা বেয়াকরণ', শিবাঅঙ্গাণ পাবলিকেশন, প্রথম সংস্করণ ২০২১
৫। ধীরেন্দ্রনাথ সাহা, 'ঝাড়খণ্ডী বাংলা উপভাষা', ১৯৮৩, রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচি
৬। ধীরেন্দ্রনাথ সাহা, 'ভাষাতত্ত্ব ও ভারতীয় আর্যভাষা', জানুআরি ১৯৭১, নরসিংহগড়, ধলভূমগড়
৭। নির্মল দাশ, 'চর্যাগীতি পরিক্রমা', দে'জ, জুন ২০১৭
৮। পরেশচন্দ্র মজুমদার, 'বাঙলা ভাষা পরিক্রমা', দে'জ, পরিববর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ জুন ২০০৪
৯। বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত, 'ঝাড়খণ্ডী বাংলা শব্দ কোষ', কালবেলা, নভেম্বর ২০০৪
১০। বৈদ্যনাথ ত্রিপাঠী, 'ঝাড়খণ্ডী ভাষাগুচ্ছের পাঁচ সহোদরা', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, বইমেলা ২০২০
১১। মঞ্জয় প্রামাণিক, 'খাঁটি কুরমালী', শিবাঅঙ্গাণ পাবলিকেশন, প্রথম সংস্করণ ২০২২
১২। রঞ্জিকুমার প্রামাণিক, 'খাঁটি পাঁচপরগণীয়া', শিবাঅঙ্গাণ পাবলিকেশন, প্রথম সংস্করণ ২০২২
১৩। রামেশ্বর শ', 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা', পুস্তক বিপণি, ষষ্ঠ মুদ্রণ, মাঘ ১৪২৬
১৪। সুকুমার সেন, 'ভাষার ইতিবৃত্ত', সম্পাদক সাহিত্যসভা বর্ধমান, পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৫৭
১৫। সুধীরকুমার করণ, 'সীমান্ত বাংলার লোকযান', করুণা প্রকাশনী, ফাল্গুন ১৩৭১
১৬। সুধীরকুমার করণ, 'সীমান্তরাঢ়ী ও ঝাড়খণ্ডী বাঙ্‌লার গ্রামীণ শব্দকোষ', এশিয়াটিক সোসাইটি, ডিসেম্বর ২০০২
১৭। সুধীরকুমার রায়, 'আধুনিক নাগপুরী : ভাসা আউর সাহিত', মার্গদর্শন পাবলিকেশন, রাঁচি, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০২২
১৮। সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা (১১০০-১৯০০ খ্রী.)', সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম ১৯৭৪
১৯। Suniti Kumar Chatterjee, 'The Origin and the Development of the Bengali Language', Calcutta press, 1926. vol. 1-3
২০। G. A. Grierson, 'Linguistic Survey of India', 1928.

লেখক পরিচিতি: তপনকুমার মণ্ডল, অধ্যাপক, বহড়াগোড়া কলেজ, বহড়াগোড়া, পূর্বসিংভূম, ঝাড়খণ্ড